ISSN:3139-1192(Online)

SCINTIA

Online Peer-reviewed Multidisciplinary Journal

December 2024

Volume- 2

Netaji Satabarshiki Mahavidyalaya, Ashoknagar,
North 24 Parganas, West Bengal- 743223

Contents lists available at https://scintia.in/

SCINTIA

Online Peer-reviewed Multidisciplinary Journal

ISSN: 3139-1192 (Online)

[Published by Netaji Satabarshiki Mahavidyalaya]

অদ্বৈত মল্লবর্মণ "তিতাস একটি নদীর নাম": মালো সমাজের জীবনযাত্রার অনবদ্য আখ্যান

সুরেশ মণ্ডল

গবেষক, সিধো কানহো বিরসা বিশ্ববিদ্যালয়, পুরুলিয়া, পশ্চিমবঙ্গ

বিষয় চুম্বক

মালো সমাজের প্রতিনিধি হওয়ার দরুণ সেই সমাজের সুখ-দুঃখ, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক জীবনচিত্র ছিল তাঁর নখদর্পনে। উপন্যাসের প্রতিটি ছত্রে ছত্রে রয়েছে ব্রাত্য মানুষদের (বিশেষত মালো শ্রেণির) জীবনের ঘন কালো মেঘ ও সংগ্রামের কাহিনি। উপন্যাসটিতে তথাকথিত নাগরিক জীবনের মেকি প্রভাব নেই এমনকি রাজনৈতিক কূটকাচালি থেকেও উপন্যাসটি ব্রাত্য। "তিতাস একটি নদীর নাম" উপন্যাসটির মধ্যে রয়েছে নদীকেন্দ্রিক মানুষদের আখ্যান।

নদীপ্রান্তে মালোদের অবস্থান হওয়ার কারণে নদীর সঙ্গে তাদের যোগাযোগ জন্মলগ্ন থেকেই। মালো সম্প্রদায়ভুক্ত মানুষের খোরাক জোগায় তিতাস নদী। তিতাসকে নিয়ে

To cite this article: Mondal, S. (2024). অদ্বৈত মল্লবর্মণ "তিতাস একটি নদীর নাম": মালো সমাজের জীবনযাত্রার অনবদ্য আখ্যান. *Scintia*, 2, 103–114.

মালোদের আশা, আকাঙ্ক্ষা, উদ্দীপনা কোনোদিন শেষ হয় না। নদী ছাড়া মালোদের অবস্থা জলহীন মাছের মতো। "তিতাস একটি নদীর নাম" উপন্যাসে দলিত সমাজের পদাবলীকে চিত্রায়িত করা হয়েছে।

সূচক শব্দঃ আত্মিক, বহুচর্চিত, দুর্ভাগ্যের, নখদর্পনে, গোষ্ঠীকেন্দ্রিক, নদীপ্রান্তে, জলকেন্দ্রিক।

Correspondent author E-mail address: suresh.mon2016@gmail.com.

> "ব্রাত্য জীবনের ব্রাত্য লেখক অদ্বৈত মল্লবর্মণ। দীর্ঘদিন তাকে আড়ালে রেখেছিল উপেক্ষার কালোপর্দা। কিন্তু তার কালজয়ী সৃষ্টিসম্ভার তাঁকে পুনর্জন্ম দিয়েছে অবহেলার আড়াল থেকে এনে শ্রদ্ধা ও প্রশংসার আলোক বেদীতে তাঁকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করেছে।" –কবি অনিল সরকার

নিম্নবর্গীয় সমাজের একজন অন্যতম ঔপন্যাসিক অদ্বৈত মল্লবর্মণ ১৯১৪ সালে ১লা জানুয়ারী অবিভক্ত ত্রিপুরা রাজ্যের ব্রাহ্মণবাড়িয়া শহরের গোকর্ণগ্রামে (বর্তমানে বাংলাদেশে) জন্মগ্রহণ করেন। জন্মলগ্ন থেকেই তাঁর তিতাসের সঙ্গে আত্মিক সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। "মোহাম্মদী" পত্রিকাতে কাজ করার সময় অদ্বৈত মল্লবর্মণের বহুচর্চিত "তিতাস একটি নদীর নাম" উপন্যাসটি ১৩৫২ সালের শ্রাবণ থেকে মাঘ মাস পর্যন্ত সাতটি সংখ্যায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়। তাঁর রচিত অন্যান্য উপন্যাসগুলির মধ্যে অন্যতম হল "Irving stone"-এর (ভ্যান গখের জীবন নিয়ে লেখা) "Lust for life" -এর অনুবাদমূলক উপন্যাস "জীবনতৃষা" ১৯শে মার্চ ১৯৪৯ থেকে ২০শে মে ১৯৫০ সাল পর্যন্ত ধারাবাহিকভাবে "দেশ" পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। "সোনারতরী" পত্রিকার শারদ সংখ্যায় "শাদাহাওয়া" নামে একটি বড় উপন্যাস প্রকাশিত হয়।

লেখকের জীবনের শেষ সাহিত্যকীর্তি হল "তিতাস একটি নদীর নাম" যা লেখকের মৃত্যুর পাঁচ বৎসর পর প্রকাশিত হয়। দুর্ভাগ্যের বিষয় এই উপন্যাসের মুদ্রণ লেখক দেখে যেতে পারেননি।

"তিতাস একটি নদীর নাম" উপন্যাসটি "মালো" নামের বাংলার নিম্নবর্গীয় জনজাতির জীবনের মহাকাব্য। উপন্যাসের প্রতিটি ছত্রে ছত্রে সমাজের অনগ্রসর মানুষের জীবনের আর্থিক অবনতির ঘন কালো মেঘ এবং জীবন সংগ্রামের এক মর্মস্পর্শী কাহিনি চিত্রিত হয়েছে। উপন্যাসের লেখক স্বয়ং "মালো" জনগোষ্ঠীরই একজন সেই কারণে এই সম্প্রদায় মানুষের জীবনযাত্রা তাঁর সকল কিছু নখদর্পনে। তথাকথিত নাগরিক জীবনের মেকি সভ্যতার কোন স্পর্শ নেই, নেই কোনো রাজনৈতিক কূটকাচালি, এই উপন্যাসের মধ্যে রয়েছে শুধু নিম্নবর্গের মানব সমাজের গোষ্ঠীকেন্দ্রিক জীবন সংগ্রামের জ্বলন্ত এক প্রতিচ্ছবি। তিতাস নদীর সঙ্গে মালোদের জীবন একসূত্রে গাঁথা। অথচ ইতিহাস ঘাটলে আমরা জানতে পারি যে, মহাভারতের যুগেও ভারতবর্ষের বুকে মালোদের অধিষ্ঠান ছিল। জলকেন্দ্রিক মৎস্যজীবীরা বাংলার অর্থনৈতিক ও সামাজিক ইতিহাস চর্চায় ভারতীয় উপমহাদেশে চিরকাল উপেক্ষিত থেকে গেছে কারণ তাদের একটাই পরিচয় তারা দলিত শ্রেনির মানুষ। কৈবর্ত্য বিদ্রোহের পরপর সময় থেকে ইতিহাসে "মালো" সম্প্রদায়ভুক্ত মানুষ মর্যাদা লাভ করে। নদীপ্রান্তে মালোদের অবস্থান হওয়ার কারনে নদীর সঙ্গে যোগাযোগ জন্মলগ্ন থেকেই। যেহেতু এই সম্প্রদায়ভুক্ত মানুষের খোরাক জোগায় তিতাস নদী তাই তাকে নিয়ে তাদের আশা, আকাঙ্ক্ষা, উদ্দীপনা কোনোদিন শেষ হয় না। নদী ছাড়া মালোদের অবস্থা জলবিহীন মাছের মতো। লেখক জানিয়েছেন যে, "তাদের দিনে রাতের সাথী বলিতে এই নদী। এই মনের অলিতে গলিতে তাদের অবাধ পথ-চলা। এর নাড়ি-নক্ষত্র তাদের নখদর্পণে। কাজেই স্রোতের একটুখানি আড় টিপিয়াই বুঝিতে পারে কোথায় এর ব্যাধি ঢুকিয়াছে। বুঝিতে পারে এর বুকের কাছেই কোথাও খুব বড় একটা চর ভাসিতেছে।"

অন্যান্য সকল নদীর মধ্যে অপাংক্তেয় অবহেলিত তিতাস নদী। আর এই অবহেলিত নদীর চির অবহেলিত বাসিন্দা হল মালোরা। তিতাস নদী যে জায়গা থেকে ধনুকের মতো বাঁক ধরেছে সেখান থেকেই শুরু হয়েছে গ্রাম। এই গ্রামের দক্ষিণ পাড়াতেই মালোদের বাস। চিত্রকরের মত তুলির টানে রঙের কারুকার্যে নিজের সমস্ত চিন্তাধারাকে চিত্রের মধ্যে বাস্তবায়িত করেছেন লেখক। পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে মালো সমাজের মাধ্যমে লেখক নিজের আত্মোপলব্ধির মর্মব্যথাকে ভদ্র সমাজের কাছে উপস্থাপনা করেছেন। মালোদের আচার-আচরণ, বিশ্বাস-সংস্কার, পোষাক-পরিচ্ছদ, উৎসব-অনুষ্ঠান, ক্রিয়া-কর্ম, ক্রীড়া-ভাষা কোনো কিছুই লেখকের দৃষ্টি এড়িয়ে যায়নি। তিতাসের পাড়ে নৌকার নোঙর করা, মাটিতে জাল ছড়িয়ে রাখা, উঠানের কোণে গাবের মটকির স্তূপ করে রাখা, ঘরে ঘরে চরকি কাটা, তকলি সুতো কাটা, জাল বোনার সরঞ্জাম এই সকল কিছুই মালোদের সম্পত্তি যার মধ্যে লুকিয়ে রয়েছে তাদের পরিচয়, গৌরব এছাড়া অস্তিত্ব; এই সমস্ত কিছু নিয়েই তাদের সংসার গড়ে উঠেছে। সংস্কৃতি হল এক একটি জাতির মেরুদন্ড; এই সংস্কৃতিকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য তারা নিজেদের প্রাণ দিতেও প্রস্তুত। উপন্যাসের মধ্যেই কুমারী মেয়েদের মাঘ মাসের শেষে যে ব্রত পালনের কথা আছে তার মধ্য দিয়ে পারিবারিক বন্ধনকে দৃঢ় করে তোলে। পুতুল খেলার মধ্য দিয়ে পারিবারিক বন্ধনের যোগসূত্র দৃঢ় হয়ে ওঠে। এই কারণে মাঘমণ্ডল ব্রতের আগ্রহ তাদের কাছে কোনো দিন কমে না। নিম্নবর্গীয় শ্রেণির এই ছোট ছোট আনন্দগুলিকে কেন্দ্র করে কবি সুকান্ত ভট্টাচার্য বলেছেনঃ

"ক্ষুধার রাজ্যে পৃথিবী গদ্যময়"

বাংলায় অবহেলিত মালো সমাজের জীবন পদাবলী রচিত হয়েছিল শুধু জীবন সংগ্রামের যন্ত্রণাকে সর্বসমক্ষে প্রকাশ করার জন্য। মালো জনজাতিদের মধ্যে ধর্মগত ভিন্নতা থাকলেও তাদের মধ্যে ছিল না কোনো সামাজিক অবস্থানরত জাতপাতের ভিন্নতা। উপন্যাসের মধ্য দিয়ে আমরা হিন্দু-

মুসলমানের সখ্যতাকে অন্বেষণ করতে পারি মালো সমাজের মাধ্যমে; এক হিন্দু যুবক কত সহজে মুসলমান যুবতীকে তার আপন মনের কথা বলতে পারে তা সুন্দরভাবে বাস্তবায়িত করেছেন উপন্যাসের মধ্যে। থাকঝি শিবাশঙ্কর পিল্লাই রচিত "চেম্মিন" (১৯৫৬) উপন্যাসের মধ্যেও নদীর উপর নির্ভরশীল মানুষের প্রতিচ্ছবি চিত্রায়িত হয়েছে। দুটি উপন্যাস নদীকেন্দ্রিক হলেও গঠনগত দিক থেকে ভিন্ন মেরুতে অবস্থান করছে। "তিতাস একটি নদীর নাম" উপন্যাসের লেখক যেমন রাজনৈতিক কূটকাচালিকে দূরে সরিয়ে রেখে নিম্নবর্গীয় সমাজের জীবন সংগ্রামকেই প্লট হিসেবে বেছে নিয়েছেন অন্যদিকে "চেম্মিন" উপন্যাসে রাজনৈতিক ছলনায় হয়ে উঠেছে প্রধান উপজীব্য বিষয়; কারুথাম্মা বাবা পারিকুট্টির কাছ থেকে সমস্ত সুযোগ সুবিধা ভোগ করে তাকে সমাজ থেকে যেমন বঞ্চিত করেছে তেমনি তিনটি জীবনকে অনিশ্চিত ভবিষ্যতের দ্বারপ্রান্তে দাঁড় করিয়েছে অর্থের লালসায় মগ্ন হয়ে, সেদিক থেকে "তিতাস একটি নদীর নাম" উপন্যাসের কাহিনিতে দলিত সমাজের পদাবলীকে চিত্রায়িত করা হয়েছে।

অদ্বৈত মল্লবর্মণ "তিতাস একটি নদীর নাম" উপন্যাসের পটভূমি সংগ্রহ করেছিলেন তাঁর যাপিত জীবন থেকে। ব্যক্তিগত জীবনে লেখক ছিলেন স্বয়ং মালো সম্প্রদায় শ্রেণির, নদীমাতৃক অঞ্চলে বসবাসের সুবাদে মালো সমাজের জীবনযাত্রার সকল সংগ্রামই ছিল তাঁর অবগত। তিনি প্রত্যেকটি ঋতুতে মালো সমাজের বৈচিত্রময় জীবনকে পাঠকমহলে খুব সুন্দরভাবে উপস্থাপনা করেছেন এই উপন্যাসের মধ্য দিয়ে। গ্রীষ্মের তিতাস সম্পর্কের লেখক বর্ণনা করেছেনঃ

"কিন্তু তিতাসে কত জল! কত স্রোত! কত নৌকা! সব দিক দিয়াই সে অকৃপণ।

আর বিজয় নদীর তীরে যে মালোরা ঘর বাঁধিয়া আছে, তাদের কত কষ্ট নদী শুখাইয়া গেলে তাদের নৌকাগুলি অচল হইয়া থাকে আর কাঠ-ফাটা রোদে কেবল ফাটে।

তিতাস তীরের মালোরা যারা সেখানে বেড়াইতে গিয়াছে চৈত্রের খরায় নদী কত নিষ্করুণ হয় দেখিয়া আসিয়াছে। রিক্ত মাঠের বুকে ঘূর্ণির বুভুক্ষা দেখিতে দেখিতে ফিরতি পথে তারা অনেকবার ভাবিয়াছে, এর আগেই হয়ত তাদের বুক শুখাইয়া যাইবে। ভাবিতে ভাবিতে হঠাৎ পাশের জনকে নিতান্ত খাপছাড়াভাবে বলিয়াছেঃ 'বিজনার পারের মালো গুষ্টি বড় অভাগা রে ভাই, বড় অভাগা'।"

আবার অন্যদিকে অঘ্রাণ মাসে মালোদের যে সুখের মাস সেটিকে লেখক শিল্পীর হাতে আঁকা মনোরম ছবির সঙ্গে চিত্রায়িত করেছেনঃ

"অঘ্রাণ মাসে পাকা ধানের মৌসুম। মাঘ মাসে সর্ষে ফুলের অজস্র হাসি। তারপর পল্লী। ঘাটের পথ ঘাট। সে ঘাটের জীবন্ত ছবি। মা তার নাদুস-নুদুস ছেলেকে ডুবাইয়া চুবাইয়া তোলে। বৌ-ঝিরা সব কলসী লইয়া ডুব দেয়। পরক্ষণে ভাসিয়া উঠে। অল্প দূর দিয়া নৌকা যায়, একের পর এক। কোনোটাতে ছই থাকে কোনোটাতে থাকে না। কোনো কোনো সময় ছইয়ের ভিতর বউ থাকে।"

দুই

বাংলা সাহিত্যে প্রথম নদীকেন্দ্রিক উপন্যাস "পদ্মানদীর মাঝি" (১৯৩৬) মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় রচনা করেছিলেন। এর ঠিক কয়েক বছর পর রাঢ় বঙ্গের নদীকে কেন্দ্র করে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় রচনা করেছিলেন "হাঁসুলী বাঁকের উপকথা" (১৯৪৭)। সুতরাং বলা যেতে পারে যে, নদীকেন্দ্রিক দলিত মানুষজনদের নিয়ে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় যে সাহিত্যধারার সূত্রপাত করেছিলেন সেই সাহিত্যধারাকে পূর্ণতা দিয়েছেন তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, সমরেশ বসু (গঙ্গা), অদ্বৈত মল্লবর্মণ ও অন্যান্য সাহিত্যিকেরা। অদ্বৈত মল্লবর্মণ ছিলেন দলিত সমাজের লেখক; তাঁর সাহিত্য প্রধানত দলিত শ্রেণির মানুষের জীবনযাত্রার উপর নির্ভর করে গড়ে উঠেছে। দলিত

সাহিত্যের প্রধান উপকরণ গুলির মধ্যে সমস্ত উপকরণই তাঁর সাহিত্য সৃষ্টিতে বিদ্যমানঃ

একঃ Demand of situation সময়ের ডাক বা যুগের ডাক। সৃষ্টির দায়বদ্ধতা এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট।

দুইঃ Identity of Ethnicity-নিজস্ব পরিচয় পুরাণ বা শিকড়ের সন্ধান।

তিনঃ Naturality of Experience- সাহিত্য সরাসরি হাত পাতে মানুষের জীবনের কাছে এককথায় বলতে গেলে বাস্তব অভিজ্ঞতা কেন্দ্রিক সৃষ্টি আপন সরসতায় মধুর্যপূর্ণ হয়। নদী, লোকায়ত সংস্কৃতি এবং দলিত বা ব্রাত্য জীবনের যুগলবন্দিকে কেন্দ্র করেই অদ্বৈত মল্লবর্মণ তাঁর সাহিত্যকে সৃষ্টি করেছেন। "তিতাস একটি নদীর নাম" উপন্যাসে জেলেরা, মালো ও গাবররা যেখানে ব্রাত্য মানুষ, সেই ব্রাত্য মানুষগুলিকে কেন্দ্র করে লেখক গড়ে তুলেছিলেন জীবন যুদ্ধে হার না মানা ব্রাত্য মানুষদের সংগ্রামের মহাকাব্য। সমাজতাত্ত্বিক প্রেক্ষাপটকে বিশ্লেষণ করে এক ভাসমান সমাজের ছবি আবিষ্কৃত হয় "তিতাস একটি নদীর নাম" উপন্যাসের মধ্য দিয়ে; যার ফলে আবিষ্কার হয় এক নতুন জগতের। লেখক এই উপন্যাসের মধ্য দিয়ে যেভাবে নিম্নবর্গীয় শ্রেণির মানুষদের জীবন সংগ্রামের যে ছবি চিত্রায়িত করেছেন তা আর কোনো লেখকের সাহিত্যে সেইরকমভাবে পাওয়া যায় নাঃ "ভোরের হাওয়ায় তার তন্দ্রা ভাঙ্গে, দিনের সূর্য তাকে তাতায়; রাতের চাঁদ ও তারারা তাকে নিয়ে ঘুম পাড়াইতে বসে, কিনতু পারে না"। তিতাস যেমন এখানে তার নিজস্ব অহং-এ চলে তেমনি তিতাসের উপকূলে বসবাসকারী ব্রাত্য মানুষেরা তাদের নিজস্ব অহং-এ চলতে ভালোবাসে। তাদের মধ্যে থাকে না কোনো রাজনৈতিক কুটিলতা, জটিলতা। তারা শোষিত হলেও কখনও কাঙালে পরিনত হতে শেখে নি।

অপরদিকে উপন্যাসে ব্রাত্য জীবনের দরিদ্রতার কথা বলতে গিয়ে লেখক বলেছেন যে "উঠানের একদিকে একটা ডালিম গাছ। পাতা শুখাইয়া গিয়াছে। গৌরাঙ্গ সুন্দরের বউ

লাগাইয়াছিল। বউ যৌবন থাকিতে শুখাইয়া গিয়েছিল। বুকের স্তন দুটি বুকেই বসিয়া গিয়াছিল তার। তারপর একদিন সে মরিয়া গিয়াছিল। সে মরিয়া গিয়া গৌরাঙ্গকে বাঁচাইয়াছে। তার কথা গৌরাঙ্গ সুন্দরের আর মনে পড়ে না। তারই মত শুখাইয়া যাওয়া তারই হাতের ডালিম গাছটা চোখে পড়িতে আজ মনে পড়িয়া গেল। উঃ বউটা মরিয়া কি ভালই না করিয়াছে! থাকিলে আজ তার অবস্থা হইত ঠিক নিত্যানন্দ দাদার মত।

নিত্যানন্দ থাকে উত্তরের ঘরে। তার বউ আছে। আর আছে একটি ছেলে, একটি মেয়ে। নিত্যানন্দের পরিবারের দিকে চাহিয়া গৌরাঙ্গ শিহরিয়া উঠে! এক পেটের ভাবনা নিয়াই বাঁচি না, দাদা চারিটা পেটের ভাবনা মাথায় করিয়া কেমন তামাক খাইতেছে। তার যেন কোনো ভাবনা নাই। যতই ভাবিয়াছে, দেখিয়াছে কোনো কূল কিনারা পাওয়া যায় না। বউ ঝিমাইতেছ ছেলেমেয়ে দুইটা নেতইয়া পড়িয়া কিসের নির্ভরতায় অক্ষম নিত্যানন্দের মুখের দিকে চাহিয়া আছে। আর নিত্যানন্দ কোন উপায় না দেখিয়া তামাক টানিতেছে।”

তিন

তিতাস নদী মালোদের জীবনযাত্রার বাঁধনকে একসূত্রে বেঁধে রেখেছে। জন্মের পর থেকেই নদীকে দেখে আসছে মালো সম্প্রদায়ভুক্ত মানুষেরা তাই তাদের তিতাসকে নিয়ে আশা, আকাঙ্ক্ষা, উদ্দীপনা কোনোদিন শেষ হয় না। কারণ, মালো শ্রেণির মানুষজন জানে যে, মেঘনা, পদ্মার সঙ্গে তিতাসের তুলনা ন্যায়সঙ্গত নয়। বড় বড় নদীতে যেমন তুফানের প্রকোপ থাকে সেই প্রকোপ থেকে তিতাস একেবারে মুক্ত। তাই কালবৈশাখীর ঝড়ের সময় মালো পুরুষেরা তিতাসের বুকে মাছ ধরতে গেলেও তাদের মা বউদের দুশ্চিন্তার কোনো কালো প্রহর গুনে অপেক্ষারত থাকতে হয় নাঃ “তিতাসের বুকে ঝড় তুফানের রাতেও স্বামী পুত্রদের পাঠাইয়া ভয় করে না। বউরা মনে করে স্বামীরা তাদের বাহুর বাঁধনেই আছে, মায়েরা ভাবে ছেলেরা ঠিক মায়েরই বুকে মাথা এলাইয়া

দিয়া শান্ত মনে মাছ ভরা জাল গুটাইতেছে।”

তিতাসের পারে বসবাসকারী অবহেলিত মানুষদের মধ্যে নেই অর্থের প্রতিস্পর্ধা, নেই কোনো বংশের অহঙ্কার, তাদের মধ্যে আছে শুধু মানুষের প্রতি প্রেম প্রীতি ও ভালোবাসার বন্ধন। বলা যেতে পারে যে, তারা মানবতার জয়গানে পিলসুজের মত সমাজকে আলো দেখিয়ে নিজেদেরকে অন্ধকারের মধ্যে নিমজ্জিত করেছে। জামিলা, কাদির, উদয়তারা, অনন্তের সম্পর্ক যেন গ্রথিত হয়ে যায় নদীর সঙ্গে। নদীর গতিময়তা আর অনন্তের চঞ্চল মন একই ধারায় প্রবাহিত। বসন্তের বাতাস শুধু নদীর জলে এসে ধাক্কা মারে না সেই সঙ্গে কিশোরের মন হৃদয় বসন্তের সমীরণে দোলায়িত খেয়ে নাচতে থাকে। নদীর বুকের মতো কিশোরের বুকে প্রেমের জোয়ার ঢেউ খেলতে থাকে। তার সঙ্গে সঙ্গে নদীর মধ্যে সূর্যের সোনালী আভা কিশোরের উন্মাদনা আনন্দের রঙকে আরও প্রগাঢ় করে তুলেছে। মালোদের নিয়ম রীতি আচার অনুসারকে মেনে কিশোর শুকদেবপুরের এক মেয়েকে বিয়ে করে। কিন্তু দাম্পত্য জীবনের সুখভোগ কিশোরের কপালে ছিল না। শুকদেবপুর থেকে নববিবাহিতা স্ত্রীকে নিয়ে কিশোর বাড়ি ফেরার পথে স্ত্রীকে হারিয়ে ফেলে সে পাগলে পরিনত হয়ে যায়।

“নয়াবসত” খণ্ডে লেখক এই ঘটনার চার বছর পরের কাহিনি তুলে ধরেছেন। “তিতাস একটি নদীর নাম” উপন্যাসে লেখক অনন্ত চরিত্রের মধ্য দিয়ে নিজের সত্তাকে উন্মোচিত করার চেষ্টা করেছেন। প্রথম নৌকোতে উঠে অনন্ত যেন আত্মহারা হয়ে পড়েছে। মালোর ছেলে হিসেবে অনন্ত কিছু কিছু স্বভাবসিদ্ধ অধিকার অর্জন করেছে যেমন নদীর গাঙ দেখা, নদী বুকে মাছ মারা, রাত জেগে নদীতে ঘুরে বেড়ানো প্রভৃতি। মায়ের সঙ্গে যখন সে মালো পাড়ায় আস্তানা গাড়ল তখন মালোরা তাদেরকে খুব সহজেই গ্রহণ করেছিল। মালোরা নিজের উদ্যোগে জঙ্গল কেটে ঘর তৈরি করে দিয়েছিলঃ “এ গাঁয়ে একজন নতুন বাসিন্দা আসিয়াছে, খবরটা যারাই পাইল

তারাই খুশি হইল। মালোপাড়ার সবচেয়ে যে ধনী ছিল, তারই গিন্নি কালোর মা ছেলেদের বলিয়া একখানা পোড়া ভিটি কমদামে ছাড়িয়া দিল, ছেলেমেয়েরা হৈ চৈ করিয়া তার আগাছা সাফ করিল, তারপর পাড়ার পাঁচজনে মিলিয়া তার উপর একখানা ঘর করিয়া দিল।”

আবার, শোষক শোষিতের যে দ্বন্দ্বটি রয়েছে সেটিও পাঠক সমাজের চোখ এড়িয়ে নিয়ে যেতে পারেননি লেখক। মধ্যসত্ত্বভোগী দালালের রক্তচক্ষুকে ফাঁকি দিয়ে মালোরা নিজেদেরকে বাঁচাতে গিয়ে নিস্তেজ হয়ে পড়েছিল। সমাজের বৃত্তশ্রেণির মানুষের কাছে মাথা তুলে দাঁড়ানোর অধিকার মালোদের কোনো কালেই ছিল না; সমাজে ব্রাত্য হওয়ার দরুণ তাদের ছেলেমেয়েরা কখনোই স্কুলের মুখ দেখতে পারত না, যদিও বা কেউ কেউ দেখত কিন্তু অর্থনৈতিক সংকটের কারণে তারা বেশি দূর এগোতে অক্ষম ছিল। শাষকের অত্যাচার তাদের উপর তীব্র থেকে তীব্রতর হতে শুরু করেছিল যখন ব্রাহ্মণরা মালোদের অস্তিত্ত্বের উপর আঘাত হানতে শুরু করে, ঠিক সেই সময় থেকেই মালোরা জীবিকা নির্ভরের জন্য গ্রাম থেকে মাছ কিনে শহরে গিয়ে বিক্রি করলে জমিদারের লোকেদের দু আনা করে মাশুল দিতে হত। এছাড়াও মালোদের কাছে ব্রহ্মণেরা ছিল দিকনির্শকের মতো। তারা সর্বদাই ভাবতো যে উচ্চশ্রেণির শিক্ষিত ব্রাহ্মণরা তাদের থেকে বিদ্যা, বুদ্ধি, জ্ঞানে ও বিচক্ষণ ক্ষমতায় অনেক এগিয়ে এর ফলস্বরূপ নিম্নবর্গীয় শ্রেণির মানুষদের শায়েস্তা করতে উচ্চশ্রেণির মানুষেরা বিভিন্ন কূটকৌশলও রচনা করত। তামসীর বাপের ঘরে উচ্চবর্ণের লোকেরা যে আড্ডা জমায়, আসলে মালোদের কৌমসংস্কৃতির উপর আঘাত আনায় ছিল এর প্রধান কারণ। এর ফলে অনন্যোপায় হয়ে কায়েতের দোকানের জিনিস কিনলে আসতে আসতে তারা সুদের জালে জড়িয়ে পড়তে থাকলঃ “সেদিন হইতে মালোপাড়ার আকাশে এক খন্ড কলো মেঘ ভাসিয়ে থাকিল। কেউ জানিল না তার ছায়া কালক্রমে কতখানি আতঙ্কের বিষয় হইয়া উঠিবে”।

চার

মাঘমণ্ডলের ব্রতকে যে মালোরা নিজেদের বড় উৎসব বলে মনে করত সেই উৎসবে সমৃদ্ধ ভাণ্ডারও যেন বিষাক্ত সাপের দংশনে আস্তে আস্তে নিঃশেষিত হয়ে যায়। রূপ রস গন্ধে যে সংস্কৃতিতে ভরপুর ছিল সেই সংস্কৃতির ভিতর তারা আর প্রবেশ করতে পারত না। কারণ যাত্রাগানের দল তাদের সংস্কৃতিকে নষ্ট করে দিয়েছিল। এর ফলে মালোরা হুকা ছেড়ে সিগারেট ধরল, গুরুজনদের প্রতি কোনো শ্রদ্ধা ছিল না, অর্থ উপার্জন করার কোনো ইচ্ছা ছিল না। উচ্চবর্ণের মানুষেরা ঋণের দায়ে জর্জরিত করে আব্রু বিসর্জন দিতে বাধ্য করেছিল। এর ফলে তাদের কাছে পড়েছিল শুধু অপেক্ষারত মৃত্যুর দিনগুলি।

তিতাসের বুকে জেগে ওঠা চরই মালোদের ভিতর বিবাদের সূত্রপাত সৃষ্টি করে। রামপ্রসাদ নিজের বাড়ির সোজাসুজি জেগে ওঠা চরকে দখলে আনার জন্য ঝাঁপিয়ে পড়ে। রামপ্রসাদ এর মতো করমআলী, বন্দেআলীও এসেছিল চর দখল করতে কিন্তু তাদের ভাগ্যে এক টুকরো মাটিও জোটেনি। তিতাসের বুকে জেগে ওঠা চরের অধিকারী ছিল বৃত্তশালী প্রতিভাবান লোকেরা। তিতাসের শুকিয়ে যাওয়ার ফলে মালোদের অবস্থার পরিনতি হয়েছে জল ছাড়া মাছের মতো। মৃত্যুর দিন গোনা ছাড়া তাদের কাছে আর কোনো পথ খোলা ছিল না। মালোরা ছিল সংস্কৃতিপ্রবণ জাতি তাই সুবিধাবাদী লোকেরা আঘাত হেনেছে তাদের সংস্কৃতির উপর। একটি জাতির সংস্কৃতিকে হত্যা করা মানে তার সম্ভ্রম ও আব্রুকে হত্যা করা। সেই কারণে লেখক মালোদের দুর্দশার কথা জানাতে গিয়ে বলেছেনঃ “অনেক মালো পরিবার গ্রাম ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছে। যারা আগেই গিয়াছে তারা ঘর দুয়ার জিনিসপত্র নৌকাতে বোঝাই করিয়া লইয়া গিয়াছে। যারা পরে গিয়াছে তারা ঘরদুয়ার জিনিসপত্র ফেলিয়াই গিয়াছে। তাহারা কোথায় গেল যাহারা রহিয়াছে জানিতেই পারিল না... কাজ করিতে না পারিয়া তারা কেবল মরিবার অপেক্ষায় আছে।

“বংশানুক্রমে যারা চিরলাঞ্ছিত, অবহেলিত, উৎপীড়িত, শোষিত, বঞ্চিত, উপেক্ষিত যাদের মধ্যে কোনোদিন স্বচ্ছলতার বোধ জন্মায়নি তাদের মধ্যে নৈতিকতার বোধের আশা করা অন্যায়। লেখক তাঁর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে মালোদের জীবনযাত্রার অশ্রুজলে সিক্ত হয়ে এমন উপন্যাস রচনার প্রয়াসী হয়েছিলেন। তাই সব দিক দিয়ে বিচার করলে দেখা যাবে যে, উপন্যাসের গঠনশৈলীর মাপকাঠিকে একদিকে রেখে আমরা বলতে পারি যে, তাঁর চিত্রিত চরিত্র ও সমাজ জীবনের বাস্তবায়ণে তিনি মৃত মানুষের মধ্যেও প্রাণরসের সঞ্জীবন ধারাকে প্রবাহিত করতে সক্ষম হয়েছিলেন।

তথ্যসূত্রঃ

ড. দাশ, নির্মল। (২০১৩, মে)। ‘লোকসংস্কৃতিঃ অদ্বৈত মল্লবর্মণ’। প্রথম প্রকাশ, অক্ষর পাবলিকেশনস, ত্রিপুরা-৭৯৯০০১, পৃঃ -৯১।

তদেব পৃ, ১৬২।

তদেব পৃ, ১৭৫।

তদেব পৃ, ২৫২।

মল্লবর্মণ অদ্বৈত। (২০১৭)। ‘তিতাস একটি নদীর নাম’। চতুর্থ মুদ্রণ,জানুয়ারি, মাইতি বুক হাউস, কোলকাতা-৭৩।

মোশেল বাসুদেব। (২০১৯)। ‘বাংলা প্রবন্ধ সাহিত্য’। প্রথম সংস্করণ, বিগ বুকস প্রকাশনী, কোলকাতা-৭৩, পৃঃ ৯৫৮।